লক্ষণা ও তার বিভিন্ন প্রকার

ন্যায় মতে শব্দ হল চতুর্থ প্রমাণ। শাব্দবোধ নামক যথার্থ অনুভবের করণ বা প্রমাণ হল শব্দ। আপ্তবাক্যকে শব্দ বলে। আর সার্থক পদসমষ্টি হল বাক্য। বাক্যার্থজ্ঞান হল শাব্দজ্ঞান। বাক্যার্থজ্ঞানের জন্য চাই বাক্যস্থিত পদের অর্থজ্ঞান। যার দ্বারা পদ বা শব্দের জ্ঞান জন্মায় তাই হল শব্দের ধর্ম বা বৃত্তি। অন্যকথায় পদ ও পদার্থ সম্বন্ধ হল বৃত্তি। এই শব্দবৃত্তি আলোচনা প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট শক্তি (অভিধা) এবং লক্ষণা নামক দুই প্রকার শব্দবৃত্তির আলোচনা করেছেন। কেউ কেউ আবার ব্যঞ্জনা নামক অতিরিক্ত একটি বৃত্তির কথা স্বীকার করেন।

শক্তি বা অভিধা হল অন্নংভট্ট স্বীকৃত প্রথম প্রকার শব্দবৃত্তি। এই পদ থেকে এই অর্থ বুঝতে হবে, এই প্রকার ঈশ্বর ইচ্ছাকে শক্তি বলে। নব্য নৈয়ায়িকদের মতে ইচ্ছামাত্রই শক্তি। একটি পদ উচ্চারিত হলে প্রথমে যে অর্থ (বস্তু) মনে আসে তাই হল শক্যার্থ বা অভিধেয়ার্থ। যেমন রাম - একটি লোকের নাম। তবে মীমাংসকগণ শক্তিকে একটি অতিরিক্ত পদার্থ হিসাবে স্বীকার করেছেন। কিন্তু অন্নংভট্ট তা খণ্ডন করেছেন।

দ্বিতীয় প্রকার শব্দবৃত্তি প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট বলেছেন, ‘লক্ষণাপি শব্দবৃত্তি’। অর্থাৎ লক্ষণাও শব্দবৃত্তি। এই লক্ষণার লক্ষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘শক্যসম্বন্ধ লক্ষণা’। অর্থাৎ শক্তির দ্বারা যে অর্থ পাই তা হল শক্য। আর এই শক্যের সহিত সম্বন্ধ হল লক্ষণা। শক্যার্থের সহিত সম্পর্কিত যে অর্থ বা লক্ষণার দ্বারা যে অর্থ পাই, তা হল লক্ষ্যার্থ বা লক্ষণার্থ। যেমন, ‘গঙ্গায়াং ঘোষঃ’ অর্থাৎ গঙ্গায় ঘোষেরা বা গোপপল্লী বসবাস করে। এখানে গঙ্গা পদের শক্যার্থ হল গঙ্গা জল প্রবাহ। আর ঘোষ হল গোপপল্লী। কিন্তু গঙ্গা জলপ্রবাহে গোপেরা বাস করতে পারে না। তাই বাক্যার্থবোধ হচ্ছে না। কিন্তু এটি আপ্তব্যক্তির বাক্য। অর্থ থাকবেই।

তাই বক্তা এই বাক্যের দ্বারা তার যথার্থ মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। তাই এই শক্যার্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত এমন কোন সংগত অর্থ করতে হবে যার দ্বারা বাক্যের অর্থ বোধগম্য হয়। গঙ্গা পদের দ্বারা জলপ্রবাহ বাধিত হয়েছে। তাই তার লাক্ষণিক অর্থ করতে হবে। তা হল গঙ্গাতীর। এটি গঙ্গা পদের শক্যার্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। এই সম্বন্ধ এখানে সামীপ্য সম্বন্ধ। গঙ্গা জল প্রবাহের সমীপে তীর থাকায়, অর্থ বুঝতে হবে গঙ্গাতীরে গোপরা বসবাস করে। সুতরাং শক্তির দ্বারা পদের অর্থ সাক্ষাৎভাবে পাওয়া যায়। আর লক্ষণার দ্বারা বা শক্যার্থের সম্বন্ধের দ্বারা পরম্পরাভাবে অর্থবোধ হয়।

এখানে কেউ হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন, গঙ্গা পদে জলপ্রবাহ এবং তীর দুই প্রকার শক্যার্থ স্বীকার করা হোক। কিন্তু একই পদের দুই প্রকার শক্তি স্বীকারে গৌরব দোষ হয়। কিন্তু লক্ষণাবৃত্তি সর্ব্ববাদীসম্মত। সুতরাং গঙ্গা পদের শক্যার্থ জলপ্রবাহ এবং লক্ষণার্থ তৎসমীপস্থ তীরই স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত। আর অভিধান বা কোষগ্রন্থে গঙ্গা পদের একাধিক অর্থ আমরা পাই না। তবে যেখানে নানার্থক শব্দ হয়, সেখানে নানাশক্তি কল্পনা বা স্বীকার দোষাবহ নয়। যেমন সৈন্ধব শব্দে লবণ ও সিন্ধুদেশীয় ঘোড়াকেও বোঝায়। এখানে একটিতে শক্যার্থ ও অন্যটিতে লক্ষণার্থ স্বীকার্য নয়। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে লক্ষণার্থ কেবল পদেরই হয়, বাক্যের নয়।

অন্নংভট্ট তাঁর দীপিকাটীকা গ্রন্থে তিন প্রকার লক্ষণা স্বীকার করেছেন। আমরা এখন অন্নংভট্ট স্বীকৃত তিন প্রকার লক্ষণার দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করব। তিন প্রকার লক্ষণা হল ঃ ১) জহৎ লক্ষণা, ২) অজহৎ লক্ষণা ও ৩) জহৎ-অজহৎ লক্ষণা।

১) জহৎ লক্ষণা ঃ যে লক্ষণায় লাক্ষণিক পদটির বাচ্যার্থ সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়, বাক্যার্থে তার অন্বয় হয় না, তাকে জহৎ লক্ষণা বলে (যত্র বাচ্যার্থস্য অন্বয়াভাবঃ তত্র জহল্লক্ষণা)। যেমন ‘মঞ্চা ক্রোশন্তি’ অর্থাৎ মঞ্চ থেকে শব্দ করছে। এই দৃষ্টান্তে মঞ্চ নামক অচেতন বস্তুতে ক্রোশন কর্তৃত্ব অনুপপন্ন হওয়ায় লক্ষণা করতে হয়। অর্থাৎ মঞ্চস্থিত ব্যক্তি ক্রোশন (শব্দ বা চিৎকার) করছে। ফলে মঞ্চের বাচ্যার্থ সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হওয়ায় এখানে মঞ্চ পদ জহৎ লক্ষণার দৃষ্টান্ত হয়েছে।

২) অজহৎ লক্ষণা ঃ যে লক্ষণায় লাক্ষণিক পদের বাচ্যার্থ সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয় না, বাচ্যার্থেরও অন্বয় হয়, তাকে অজহৎ লক্ষণা বলে(যত্র বাচ্যার্থস্য আপি অন্বয়ঃ তত্র অজহদিতি)। যেমন 'ছত্রিণো গচ্ছন্তি' অর্থাৎ ছত্রধারীরা যাচ্ছে। এখন একদল লোকের মধ্যে কিছুলোক ছত্রধারী আছে, আবার কিছুলোক ছত্রহীন। কিন্তু এই বাক্যে ছরত্রধারী ও ছত্রহীন উভয়কে বোঝাতে বক্তা বাক্য প্রয়োগ করেছেন। তাই এক্ষেত্রে অজহৎ লক্ষণা হয়েছে। কেউ কেউ আবার ভিন্ন একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টিকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। যেমন 'কাকেভ্যঃ দধিরক্ষতাম্' অর্থাৎ কাকেদের থেকে দধি রক্ষা করবে, এই বাক্যে কাক পদে কেবল কাক বুঝলে চলবে না, কাক, বিড়ালাদি যারাই দধি নষ্ট করে তাদের সবাইকে বুঝতে হবে। তাই এখানে অজহৎ লক্ষণা স্বীকার করতে হবে।

(লক্ষণা এক প্রকার শব্দবৃত্তি। এই লক্ষণা তিন প্রকার। জহল্লক্ষণা, অজহল্লক্ষণা ও জহদজহল্লক্ষণা। এর মধ্যে অজহল্লক্ষণার লক্ষণ দিতে গিয়ে অন্নংভট্ট দীপিকাতে বলেন, যত্র বাচ্যার্থস্যাপ্যন্বয়ঃ তত্র অজহদিতি। যথা ছত্রিণো গচ্ছন্তি। অর্থাৎ যে স্থলে সন্নিহিত পদের শক্যার্থ ও ভিন্ন অর্থ উভয় অর্থ অন্বিত হয়, সে স্থলে সন্নিহিত পদের শক্যার্থ ও ভিন্ন অর্থ উভয় অর্থই অন্বিত হয়, সে স্থলে বাচ্যার্থের সাথে ভিন্ন অর্থের উপস্থিতির জন্য যে লক্ষণা তা অজহল্লক্ষণা। যেমন কোন ব্যক্তি ছত্রী, রথ, হস্তী, অশ্বাদি ঘটিত একদল সেনাকে যুদ্ধে যেতে দেখে বললেন - ছত্রিণো গচ্ছন্তি। এস্থলে ছত্রিপদ শক্তি দ্বারা ছত্রধারী পুরুষকে উপস্থিত করলে যদিও তাতে গচ্ছন্তি বাক্যের অর্থ গমনানুকুল কৃতির অন্বয়ে কোন বাধা নাই, তথাপি বক্তার তাৎপর্য উপপন্ন হচ্ছেনা বুঝে শ্রোতার ছত্রি পদে একসার্থবাহিত্বরূপে ছত্রী ও অছত্রী সমুদায়ে বা একদলে যে লক্ষণা তাকেই অজহল্লক্ষণা বলে।)

জহৎ-অজহৎ লক্ষণা ঃ

যে লক্ষণাতে বাচ্যার্থের একাংশ পরিত্যক্ত হয়ে অন্য অংশ গৃহীত বা অন্বিত হয় তাকে জহৎ-অজহৎ লক্ষণা বলে(যত্র বাচ্যৈকদেশত্যাগেন একদেশান্বয়ঃ তত্র জহদজহদিতি)। যেমন উপনিষদের 'তত্ত্বমসি'(তুমি সেই হও) - এই বাক্য। এই বাক্যটি অদ্বৈত বেদান্তী স্বীকৃত মহাবাক্য। এই বাক্যে 'তুমি' - পদের বাচ্যার্থ হল জীব। জীব চৈতন্যস্বরূপ, কিন্তু অল্পজ্ঞত্ব প্রভৃতি ধর্মবিশিষ্ট। 'সেই' পদের বাচ্যার্থ হল ঈশ্বর। ঈশ্বরও চৈতন্যস্বরূপ, কিন্তু সর্বজ্ঞত্ব ধর্মবিশিষ্ট। লক্ষণার দ্বারা জীবের অল্পজ্ঞত্ব প্রভৃতি ধর্ম পরিত্যক্ত হয়েছে। আবার ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব ধর্মও পরিত্যক্ত হয়েছে। এর দ্বারা কেবল শুদ্ধ চৈতন্যমাত্রকে বুঝতে হবে। আর এইভাবে বাক্যের এক অংশ পরিত্যক্ত হয়েছে এবং অপর অংশ গৃহীত হয়েছে। তবে প্রকৃতপক্ষে এইমত নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন না। অদ্বৈত বেদান্ত মতে 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্যের এরূপ ব্যাখ্যা করা হয়।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ